করেন টমাস স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলস।

১০.৩ ডাচ কালচার সিস্টেম ও তার তাৎপর্য

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে জাভার ডাচ গভর্নর জোহানেস ভ্যানডেন বশ (Johannes Vanden Bosch) যে ঔপনিবেশিক নীতি প্রবর্তন করেন তা কাল্টিভেশন সিস্টেম বা কালচার সিস্টেম নামে পরিচিত।[৩] এর প্রকৃত পরিচয় হল সরকার নিয়ন্ত্রিত কৃষি ব্যবস্থা। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিনীয় যুদ্ধের শেষে ডাচরা জাভা ফিরে পেয়েছিল, তবে জাভার অথনীতিতে স্থিতিশীলতা ছিল না। ঔপনিবেশিক শাসনে আয়ব্যয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতি চলেছিল। ১৮২৫-৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জাভার স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে

---

৩. মূল ডাচ শব্দটি হল Cultuur Stel sel.

ডাচদের লড়াই হয়, এজন্য ডাচ শাসকদের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে বেলজিয়াম হল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এই যুদ্ধ চালানোর জন্য হল্যান্ডের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। হল্যান্ডের এই চরম অর্থনৈতিক সংকটের দিনে অভিজ্ঞ প্রশাসক বশ জাভায় নতুন নীতি প্রবর্তন করেন। তার আগে ডাচ শাসকরা দুটি বিকল্পের কথা ভেবেছিলেন—একটি হল স্থানীয় কৃষকদের স্বাধীনভাবে পণ্য উৎপাদনের অধিকার দেওয়া, অপরটি হল বিদেশি পুঁজিপতিদের জাভার কৃষিতে অর্থ লগ্নির অধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। প্রথম প্রকল্পটি ছিল র‍্যাফলস-ক্যাপেলেনের (Raffles-Capellen), দ্বিতীয়টি দু বুসের (du Bus)।

ডি. জি. ই. হল লিখেছেন যে কালচার সিস্টেম হল জাভায় ডাচদের পুরোনো জবরদস্তি সরবরাহ নীতির এক পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত রূপ। ধরে নেওয়া হয় জাভার কৃষক তার জমির যথোপযুক্ত ব্যবহার জানে না। সেজন্য সরকার তার জমির একাংশে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কৃষকের দেয় ভূমি রাজস্বের বিনিময়ে তার উৎপন্ন পণ্য নেবে। যদি উৎপন্ন পণ্যের দাম ভূমি রাজস্বের বেশি হয় কৃষক বাড়তি টাকা পাবে। যদি দেয় রাজস্ব উৎপন্ন পণ্যের বেশি হয় কৃষক সরকারি কোষাগারে বাকি রাজস্ব জমা দেবে। এইসব রপ্তানি পণ্য ডাচ জাহাজে করে হল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হবে, সেখান থেকে পৃথিবীর বাজারে তা সরবরাহ করা হবে। হল্যান্ডে উৎপন্ন শিল্পপণ্য উপনিবেশের বাজারে একচেটিয়াভাবে বিক্রি করা হবে।

বশ জাভাতে যে কালচার সিস্টেম প্রবর্তন করেন হল তার নটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। (১) সরকার কৃষকদের সঙ্গে চুক্তি করে ইউরোপের বাজারে সরবরাহযোগ্য পণ্য উৎপাদনে বাধ্য করবে। ধান জমির একাংশে এই পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে। (২) পণ্য উৎপাদনের জমির পরিমাণ হবে 'দেশের' মোট জমির এক-পঞ্চমাংশ। (৩) ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী পণ্য উৎপাদনের জন্য ধান চাষের চেয়ে বেশি শ্রমিকের প্রয়োজন হবে না। (৪) যে জমিতে বাণিজ্যিক পণ্য উৎপন্ন হবে তা হবে করমুক্ত। (৫) উৎপন্ন ফসল জেলায় পাঠানো হবে। উৎপন্ন ফসলের দাম ভূমিকরের বেশি হলে বাকিটা কৃষককে ফেরত দেওয়া হবে। (৬) কৃষকের সযত্ন প্রয়াস সত্ত্বেও ফসল নষ্ট হলে তা হবে সরকারের দায়। (৭) দেশি শ্রমিক তার প্রধানের অধীনে কাজ করবে, ফসল বসানো, তোলা, পরিবহন, স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কাজ তদারকি করবে ইউরোপীয়রা। (৮) শ্রমিকদের চার ভাগে ভাগ করা হবে—একদল ফসল বসাবে, অন্যদল ফসল তুলবে, তৃতীয় দল ফসল পরিবহনের কাজ করবে, চতুর্থ দল কারখানায় কাজ করবে। যদি মুক্ত শ্রমিক না পাওয়া যায় চতুর্থ শ্রেণির শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। এসব শ্রম ছিল বাধ্যতামূলক। (৯) বাস্তব

প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা হলে কৃষককে ভূমিকর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থায় ধরে নেওয়া হবে ফসল পাকলে কৃষকের দায় শেষ হবে। ফসল ওঠানো ও পণ্য রপ্তানিযোগ্য করার জন্য পৃথক চুক্তির প্রয়োজন হবে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এই কালচার সিস্টেম চালু হয়, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তা চলেছিল।

ভ্যানডেন বশ জাভাকে একটি লাভজনক উপনিবেশে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। চিনি ও নীল শিল্পে তিনি কালচার সিস্টেম প্রথম প্রবর্তন করেন, পরে কফি, চা, তামাক, সিংকোনা, গোলমরিচ ও তুলো চাষে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। উল্লেখ্য ভ্যানডেন বশের নির্দেশ ও বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে বিস্তর অসঙ্গতি ছিল। তিনি পরিসংখ্যানের ওপর খুব বেশি নির্ভর করেছিলেন, এই সব পরিসংখ্যানে অনেক ভুলভ্রান্তি ছিল। এজন্য নীতি নির্ধারণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে কালচার সিস্টেমের অধিকর্তা বি. জে. এলিয়াস (B. J. Elias) এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন। ইউরোপীয় ও দেশি আমলাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। অন্য অসুবিধা হল কৃষকের দক্ষতার অভাব, প্রযুক্তির অভাব, বিশেষ আঞ্চলিক পরিবেশে এই নীতি প্রয়োগের অসুবিধা, এবং জাভার মানুষের নতুন কিছু গ্রহণের মানসিক অক্ষমতা। পশ্চিমি জগতে তৎকালে প্রচলিত উদারনৈতিক অবাধমুক্ত মতবাদের সঙ্গে কালচার সিস্টেমের মিল ছিল না। পরিবেশ এর অনুকূল ছিল না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হল্যান্ডে এই ব্যবস্থার বিরোধিতা হয়। অনেকে এই ব্যবস্থাকে অনুদার, স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর বলে সমালোচনা করেছিল। বশের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়নি।

ডি. কে. এম. টেট (Tate) লিখেছেন কালচার সিস্টেমের লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে বলা যায় এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে সফল হয়। কালচার সিস্টেম তার সব লক্ষ্য পূরণ করেছিল (In terms of its aims, the culture system must be adjudged a great success)। ডাচ ঐতিহাসিক দ্য ওয়াল (de Waal) জানিয়েছেন যে জাভা হল্যান্ডকে দিয়েছিল প্রচুর সম্পদ। ভ্যানডেন বশের কালচার সিস্টেমকে বলা হয় হল্যান্ডের লাইফ-বেল্ট। হল লিখেছেন যে বশ জাভাকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে বাঁচানোর জন্য কালচার সিস্টেম প্রবর্তন করেন। অল্পকাল পরে এর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় হলান্ডের অর্থনৈতিক সুরক্ষা। আরো পরে এর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় জাভার অর্থনৈতিক ক্ষতির বিনিময়ে হল্যান্ডের সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। বশের কালচার সিস্টেমের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে যায়। জাভার আয় ব্যয়ে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে হল্যান্ড প্রতি বছর গড়ে ৯ থেকে ১৫ মিলিয়ন গিল্ডার লাভ করেছিল। ১৮৪০-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হল্যান্ড জাভা থেকে লাভ করেছিল ৭৮১ মিলিয়ন গিল্ডার। এই অর্থ দিয়ে হল্যান্ড

তার জাতীয় ঋণ পরিশোধ করেছিল, রেলপথ তৈরি হয়, আর আমস্টারডাম হয়ে ওঠে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূলধনী বাজার। কালচার সিস্টেমের ফলে লাভবান হয় নেদারল্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি (N.H.M.)। এই কোম্পানি জাভার রপ্তানি পণ্য পরিবহন ও বাজারজাত করার অধিকার পেয়েছিল।

যদিও বশ মনে করেন এই ব্যবস্থায় কৃষকের স্বাধীনতা রক্ষিত হবে, বাস্তবে তা হয়নি। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই ব্যবস্থায় জোরজবরদস্তি শুরু হয়ে যায়। প্রত্যেক রেসিডেন্টকে মাথাপিছু দুই গিল্ডার মূল্যের রপ্তানি পণ্য সরবরাহ করতে বলা হয়। কৃষক স্বাধীনভাবে উদ্বৃত্ত কফি বিক্রি করতে পারত না। বশ ধান চাষের চেয়ে বেশি শ্রম নেবার বিরোধী ছিলেন। তবে কফি, নীল ও চিনি চাষের জন্য বেশি শ্রমের প্রয়োজন হয়। এই শ্রম তারা জোর করে আদায় করেছিল। লাভের দিকে তাকিয়ে সরকার এসব অগ্রাহ্য করেছিল। দেশি ও ইউরোপীয় পরিদর্শক বাড়তি উৎপাদনের ওপর কমিশন পেত, এজন্য কৃষকের ওপর অত্যাচার হয়। এরা কৃষকের সেরা জমিতে রপ্তানি পণ্য চাষ করতে বাধ্য করেছিল। সরকারি পণ্যের চাষ আগে বসাতে হত, এজন্য ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৪৮-৫০ সময়কালে মধ্য জাভা অঞ্চলে ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, সাধারণ মানুষ দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল। স্ট্যাপেল মনে করেন কালচার সিস্টেমে পণ্য উৎপাদনকারী জমিতে ভূমিকর নিষিদ্ধ হলেও কার্যত ভূমিকর আদায় করা হত।

টেট জানিয়েছেন যে কালচার সিস্টেমের ফলে জাভার কৃষিজ পণ্য উৎপাদন বিপুলভাবে প্রসারিত হয়। চিনি, কফি ও নীলের উৎপাদন বাড়ে, এইসব পণ্য জাভার অর্থনীতিতে স্থায়ী আসন নিয়েছিল। অন্যান্য কৃষিজ পণ্য উৎপাদন দারুণভাবে উৎসাহিত হয়, এগুলি হল চা, তামাক, গোলমরিচ, দারুচিনি, তুলো, রেশম ইত্যাদি। তবে এসব পণ্য উৎপাদনে তাৎক্ষণিক সাফল্য আসেনি। পরবর্তীকালে অর্থনীতিকে মজবুত করেছিল। কালচার সিস্টেমের ফলে কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। সারা দেশে কয়েকটি জলসেচ প্রকল্প রূপায়িত হয়। এর পরোক্ষ ফল হল ব্যাংক, বিমা, বন্দর ও কারখানার সম্প্রসারণ। জাভার লোকসংখ্যা বেড়ে যায়, বাজার, জমি ও লবণ থেকে সরকারের আয় বাড়ে। চালের উৎপাদনও বেড়েছিল, বিদেশি বস্ত্রের চাহিদাও বেড়েছিল। এজন্য অর্থনীতিবিদরা মনে করেন সামগ্রিকভাবে জাভার অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছিল।

লিবারেল ডাচ ঐতিহাসিকরা মনে করেন কালচার সিস্টেম থেকে জাভার কোনো লাভ হয়নি (The Indies gained nothing)। জাভার যেসব অঞ্চলে রপ্তানি পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হয় (যেমন পূর্ব জাভা) শুধু সেসব অঞ্চলে সমৃদ্ধি এসেছিল। জাভার ৫.৫ শতাংশ অঞ্চলে মাত্র ২৫ শতাংশ লোক এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়।

সামগ্রিকভাবে সারা দেশের সমৃদ্ধি আসেনি। জাভার বাইরে ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র এই প্রথা সম্প্রসারিত হয়নি। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উন্নতির স্তরে ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়। জাভাতে দুর্ভিক্ষ হলে কালচার সিস্টেমের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। সরকার বাধ্য হয়ে ধান চাষ বাড়িয়েছিল। রপ্তানি পণ্য সরকারি গুদামে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেওয়া হয় কৃষককে। এই গুদামগুলি ছিল চাষ জমি থেকে অনেক দূরে, ৫০-৮০ মাইল দূরেও এই গুদাম থাকত। এজন্য কৃষক এটাকে অত্যাচার বলে মনে করত। তবে কালচার সিস্টেমের ফলে ইউরোপীয় আমলা, স্থানীয় প্রধান প্রিয়ায়ি (priyayi) ও চিনারা লাভবান হয়। চিনারা এজেন্ট, কনট্রাক্টর ও মিল মালিক হিসেবে কাজ করেছিল।

জাভার কালচার সিস্টেমের সবচেয়ে বড়ো সমালোচকরা হল উদারনীতিবাদী ও জাভার সদ্যোজাত জাতীয়তাবাদীরা। ফার্নিভাল মনে করেন র‍্যাফলস-মুন্টিঙ্কি যে স্বাধীন উদ্যোগী কৃষকের কথা ভেবেছিলেন তারা শেষ অবধি মহাজনের কাছে বাঁধা পড়ে যেত। আবার দু বুসের ইউরোপের পুঁজিপতিদের দিয়ে চাষ করানোর প্রকল্পে লাভবান হত বিদেশিরা। টেট লিখেছেন যে, কালচার সিস্টেমের ফলে জাভার অর্থনীতিতে দ্বৈতসত্তার আবির্ভাব হয়। বাণিজ্যিক পণ্য উৎপাদন ঘিরে গড়ে ওঠে ব্যাংক, বিদেশি মূলধন বিনিয়োগ, নতুন প্রযুক্তি, যোগাযোগ ও পরিচালন ব্যবস্থা, অন্যদিকে ছিল প্রথাগত চাষ-আবাদ। প্রথমটিতে জাভার মানুষের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। এই অর্থনীতির লভ্যাংশের সামান্য অংশ তারা পেত। এই অর্থনীতি ছিল পুঁজি-নিবিড় ও সমৃদ্ধ, দ্বিতীয়টি ছিল শ্রম-নিবিড়, এখানে জাভাবাসীদের ভূমিকা মুখ্য কিন্তু আর্থিক উন্নতি হয়নি, বরং দারিদ্র্য বেড়েছিল (It also marked the growth of a basic dichotomy in the colonial economy of the Indies, between the sphere of export crop production dominated by western capital, management and techniques on the one hand, and that of production for native consumption on the other. The first sphere where the Javanese played a purely passive role and received a diminutive share of the profits, which accrued, was capital-intensive and prosperous, the second was labour-intensive and one in which the Javanese was the central figure as he sank into deeper poverty)।[8] ডাচ সরকার ইন্দোনেশিয়াকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত করা সত্ত্বেও এখানকার সমাজ ছিল সনাতন, গ্রামীণ, কৃষিভিত্তিক ও পরিবর্তন বিমুখ। ইউরোপীয় সভ্যতা ও